WBMDFC

WBMDFC KNOWLEDGE SERIES XIV

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪–১৮৭৩)

Michael Madhusudan Dutt

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

লেখক

অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মুল্যায়ন ও প্রমাণীকৃত

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) নন্দিনী ভট্টাচার্য

Michael Madhusudan Dutt

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
জানুয়ারী, ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

Printed at Saraswaty Press Limited

প্রাক কথন

বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর সাহিত্য ভাবনা ও লেখনী সূচনা করে যুগাবসান ও এক নতুন যুগারম্ভের। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তন মননের জগতে এক অভূতপুর্ব সৃষ্টিশীলতার জোয়ার আসে যেটি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সৃষ্টিশীলতার জোয়ারকে বহু ঐতিহাসিক নবজাগরণ বা 'রেনাসাঁস' হিসাবে অভিহিত করেছেন। অনেকের মতে এই নবজাগরণের জোয়ার বেয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে 'আধুনিকতা'। অনেক ঐতিহাসিক যদিও এই 'রেনাসাঁস' থিওরিকে মানেন না। কিন্তু এই বিতর্কের গন্ডীর বাইরে মতভেদ অতিক্রম করে সকলেই একই মতামত প্রকাশ করেন যে এই সৃষ্টিশীলতার যুগে যে সব রথীমহারথীগণ তাঁদের অনবদ্য স্বাক্ষর রেখেছেন মাইকেল তাঁদের পথিকৃৎ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান দুশো বছরেরও একটু বেশী আগে। বহু স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও পন্ডিত মাইকেলের জীবনী লেখার প্রয়াস করেছেন বিগত এক শতাব্দীর উপর। কিন্তু মাইকেলের কোন জীবনীকার এটা দাবী করেন নি যে তাঁরা কেউ প্রামান্য জীবনী লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী, সৃষ্টিমগ্ন, অপরিণামদর্শী, অমিতব্যায়ী, এনিগম্যাটিক (enegmatic) এবং আদতে বোহেমিয়ান মানুষটির অস্থির জীবনচর্যার দিনলিপি জোগাড় করা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা, মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবনের নানান অভিঘাতের মূর্ত অনুভূতি লিপিবদ্ধ করা। তাই মধু জীবনী লিখতে গিয়ে অনেক পংক্তি ও বহু পৃষ্ঠাতে প্রশ্নচিহ্ন আঁকতে হয় বা ফাঁকা রাখতে হয়।

মধুকবির জীবনীকারদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্ত শিক্ষার হাত ধরে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে নতুন চিন্তন ও মননের জোয়ার এসেছিল মধুসূদনের কাব্য, নাটক ও সাহিত্য তার মূর্ত অভিব্যাক্তি। তবে বেশীরভাগ জীবনীকারই তাঁর চিন্তা জগতে এবং লেখনীতে ক্রমবিবর্তনের ধারাকেও বিশদে আলোচনা করেছেন। স্বল্প পরিসরে এই পুস্তিকাটি মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার ও সৃষ্টিশীল জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের প্রয়াস।

বাল্যজীবন থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত হওয়ার গতিপথ

মাইকেল ১৮২৪ সালের জানুয়ারী মাসে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত এবং জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান। তাঁদের আরো দুই সন্তান অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল। অতএব মধু ছিলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান। সুতরাং তিনি অপর্যাপ্ত আদর এবং প্রশ্রয় লাভ করেই বড় হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ কলকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। মধুও পর্যাপ্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দে বড় হয়েছিলেন।

মধুসূদন বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর গ্রামের বিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে এবং কোলকাতার স্কুলে তিনি অঙ্ক, বাংলা, কিছুটা সংস্কৃত এবং ফার্সী শিখেছিলেন। ফার্সী তখন অফিস, কাছারি এবং আদালতে প্রচলিত ভাষা ছিল। এছাড়াও তাঁর মা-র কাছ থেকে তিনি প্রতিদিন রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনে বাল্যকাল অতিবাহিত করেছেন। কথিক আছে জাহ্নবী দেবী তাঁকে নিয়মিত মঙ্গলকাব্য বিশেষ করে চন্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল পড়ে শোনাতেন। অর্থাৎ মধুসূদন বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন ভাষা, 'ক্লাসিক' এবং 'পপুলার' (লৌকিক) সাহিত্যের পাঠ নিয়ে বড় হয়েছেন।

পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর পরিবার নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। মধুসূদন কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি খিদিরপুর অথবা পার্কস্ট্রীটের দিকে কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন যেটা সম্পর্কে মতদ্বৈততা আছে। তবে কলকাতার স্কুলেই তাঁর ইংরাজী শিক্ষার হাতেখড়ি। মধুসূদনের জীবনীকার অমলেন্দু বসুর মতে তিনি লালবাজারের একটি গ্রামার স্কুলে পাঁচবছর পড়াশোনা করেছেন। সেখানেই তিনি ল্যাটিন, হিব্রু এবং বিভিন্ন মানবিক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

১৮৩৭ সালে মধুসূদন হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই তাঁর জীবনের অন্যতম মাইল ফলকের সূচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে জ্ঞান, মনন, সাহিত্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার জোয়ার এসেছিল— যাকে অনেক চিন্তাবিদ রেনাসাঁ বা নবজাগরণ হিসাবে অভিহিত করেছেন - হিন্দুকলেজই ছিল সেই নবচেতনার আঁতুরঘর। হিন্দুকলেজেই ১৮২৬ সালে প্রতিভাধর শিক্ষক ডিরোজিওর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। মধুসূদন ডিরোজিওর মৃত্যুর পর হিন্দুকলেজে পড়তে এসেছিলেন। তখনও কিন্তু এই আন্দোলনের অগ্নিশিখা পুরোপুরি নিভে যায়নি। মধুসূদন সেই শিখায় আলোকিত হয়ে জীবনের নতুন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলেন।

মধুসূদন স্বপ্নের সওয়ারী ছিলেন। সেই স্বপ্ন নতুন শিখায় আলোকিত গড়পড়তা বাঙালী ভদ্রলোকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা চাইতেন ডাক্তার, উকিল, জজ, ব্যারিস্টার হয়ে সমাজের ‘এলিট’ হয়ে উঠতে। আর মধুসূদন ছিলেন আদ্যন্ত রোমন্টিক। তিনি চাইতেন শেলী, কীটস, বায়রনের মত ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখে তাঁদের সমকক্ষ হয়ে খ্যাতিলাভ করবেন। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন লর্ড বায়রন। বায়রনের স্বেচ্ছাচারী জীবন ও নারীসঙ্গ তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সেটা জানা যায় না। কিন্তু বিবাহ নিয়েও তিনি বাঙালী মানসিকতা এবং সামাজিক প্রথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতামত পোষণ করতেন।

মধুসূদন দত্ত ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর যাঁকে নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর চরিত্রে আপাতবিরোধী বিভিন্ন গুণাগুণের অভূতপূর্ব সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রেম, বিবাহ, পিতামাতার প্রতি আচরণ, তাঁর জীবনচর্যা, স্ত্রী সন্তানদের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক। মধুসূদন অনেকভাবে সমলোচিত হয়েছেন তাঁর বন্ধুভাগ্য ছিল ঈর্ষনীয়। গৌরদাস বসাক আজীবন তাঁর পাশে থেকেছেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীকে

পুষ্ট করার জন্য সামর্থের বাইরে গিয়ে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাকে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং ধনী রাজা জমিদার আকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।

মধুসূদনের স্বপ্ন ও কাঙ্ক্ষিত উচ্চাশা ছিল বিলেতে/ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখে বিখ্যাত ইংরাজী কবিদের সমপর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করা। মধুসূদন ছিলেন 'এনিগম্যাটিক' এক ব্যাক্তিত্ব। তিনি জীবনে এমন অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর জীবনীকার, ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীগণ কোন কার্যকারণ খুঁজে পাননি। তেমনি একটি ঘটনা হল ১৮৪৩ সালে মধুসূদনের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। তিনি যে শুধুমাত্র ধর্মের প্রতি অনুরাগবশত খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন একথা বেশীর ভাগ জীবনীকারই মানতে চাননি। গোলাম মুরশিদ এবং অন্য কয়েকজন জীবনীকার এই ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে মধুসূদনের বাবা তাঁকে ধনী জমিদারের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। মধু তাঁর বাবাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন এই বিবাহ বিলেতে গিয়ে তাঁর কবিখ্যাতি অর্জন করার স্বপ্ন সমূলে বিনাশ করবে। সেই জন্য তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে চার্চে গিয়ে ধর্মান্তরিত হন। এই ব্যাখ্যা কতখানি গ্রাহ্য সেটা তর্ক সাপেক্ষ। তবে হিন্দুকলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ধর্মান্তরের ঘটনা কলকাতা শহরে প্রবল আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল।

মধুসূদন দত্তের ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুপ্রেরণা কি ছিল সেটা সরলীকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধর্মান্তর তাঁর জীবনে এক পরিচ্ছেদের ইতি টেনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মধুসূদন দত্তর মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিসাবে রূপান্তর বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য প্রণিধান যোগ্য অধ্যায়। জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেকে প্রস্ফুটিত করলেন একজন মহাকবি হিসাবে। পরবর্তীকালে পাঠকের অন্তরের 'মধুকবি'।

“জীবন চলন্ত ছায়া — নির্বোধের উপাখ্যান এক”
জীবন ও জীবিকার প্রথম অধ্যায়

ধর্মান্তর স্বাভাবিকভাবেই মাইকেলের জীবনে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। ধর্মান্তরিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তিনি যদিও পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করেন। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ী যেতেন। কিন্তু হিন্দুকলেজ কতৃপক্ষ তাঁকে আর প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। মাইকেলের বাবার মনে হয়ত ক্ষীণ আশা ছিল যে ছেলে আবার প্রায়শ্চিত্ত করে বাড়ী ফেরৎ আসবেন। তিনি ছেলেকে বিশপস কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেই কলেজেও মাইকেলের মেধা, বিভিন্ন ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে শিক্ষকরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু মাইকেল বিশপস কলেজে পড়াশুনো শেষ করতে পারলেন না। তাঁর বাবা পড়াশুনো করার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি সম্ভবত ছেলের ধর্মে ও স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার আশা ত্যাগ করে পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। রাজনারায়ণ পরবর্তীকালে দুটি বিবাহ করেছিলেন।

এরপর শুরু হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের নতুন জীবন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান হিসাবে অত্যন্ত স্বাচ্ছল্য ও আদরে লালিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা ব্যায়ভার বন্ধ করার পর শুরু হল কৃচ্ছসাধনের জীবন। মাইকেল স্বপ্ন দেখতেন বিলেতে যাবেন, যশস্বী কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী একজন ইংরাজী মহিলাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু তিনি হয়ত এটাও ভেবেছিলেন যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ তাঁর স্বপ্নপূরণে সহায়তা করবে। বাস্তবে কিন্তু তার সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরী হল। মাইকেল ইতিমধ্যে ইংরাজীতে অনেক লেখালেখি করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে মাইকেলের সাহিত্য জীবনের আবর্তন, বিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন বিশদে আলোচিত। এই অধ্যায়ে

আমরা দেখব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে মাইকেলের মনজগত ও লেখনীর ধারাকে কিভাবে প্রবাবিত করেছে।

কলকাতায় মাইকেলের স্বপ্নভঙ্গ হল। তিনি লেখাপড়া শেষ করতে পারলেন না। বিলেতে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা তৈরী হল না। পরিবার থেকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বন্ধুবান্ধব বিশেষ করে গৌরদাস বসাকের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ কমে গেল। সর্বোপরি তিনি আশা করেছিলেন যে ইউরোপীয় মহলে তিনি ইংরাজী সাহিত্য চর্চার যথোপযুক্ত কদর পাবেন। সেই কদর তিনি পেলেন না। সর্বোপরি পিতার অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর স্বাচ্ছন্দে লালিত মাইকেল প্রভূত আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হলেন। অবশেষে মাইকেল কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। সেইসময় তিনি সম্ভবত ধর্মযাজক হওয়ার বাসনা পোষন করেছিলেন। তবে আদ্যন্ত রোমান্টিক এই মানুষটির সেই বাসনা কতটা গভীরে প্রোহিত ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

কতিপয় ইংরাজ পৃষ্টপোষকের সহায়তায় তিনি ১৮৪৮ সালে জাহাজে করে মাদ্রাসে এসে পৌঁছলেন। তিনি যে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন তার নাম - মাদ্রাস মেইল এন্ড ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম এন্ড বয়েজ ফ্রি ডে স্কুল। সেখানেই তাঁর স্বপ্নের প্রেম হল রেবেকার সঙ্গে যিনি অবশ্যই ইংরাজ ছিলেন এবং ওই অরফ্যানেজ স্কুলেই বড় হয়েছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। রেবেকার সঠিক পারিবারিক পরিচয় নথিবদ্ধ নেই। তবে মাদ্রাসের ইংরাজ সমাজের অনেকেই একজন কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিবাহ ভালো চোখে দেখেন নি। তবে মাইকেল যে অতন্ত আহ্লাদিত হয়েছিলেন তা বোঝা যায় সেই সময় প্রকাশিত রোমান্টিক কবিতাগুলি থেকে। মাইকেল যে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তা বোঝা যায় গৌরদাস বসাককে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু দারিদ্র কবে প্রতিভা বিকাশ আটকাতে পেরেছে। সেই সময় তিনি ১৮৪৯ সালে The Captive Ladie নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখে ফেলেন Madras

Circulatory পত্রিকার জন্য। এই কাব্যের সূচনায় তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে লিখলেন :

The heart which once has sighed in solitude
And yearn'd t' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings, - well may shun the mood.
Of grief - so cold - when thou, dear one! art nigh
To sun it will smile, love's lustrous radiancy.

রেবেকা ও মাইকল চারজন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে মাইকেল কতটা পুরোনো প্রেম ও উচ্ছাস বজায় রাখতে পেরেছিলেন সেটা বলা কঠিন। তবে ওই মাদ্রাসেই তাঁর আলাপ হয়েছিল হেনরিয়েটার সঙ্গে যিনি পরবর্তী কালে মাইকেলের জীবনে আমৃত্যু সঙ্গিনী হয়েছিলেন এবং চারজন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের বিয়ে ছিল ক্ষণস্থিয়ী। তাঁর অস্থির স্বভাবের জন্য হোক অথবা পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বিবাদের জন্যই হোক মাইকেল ১৮৫৬ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেলে এলেন রেবেকা ও চারটি সন্তান যাদের মধ্যে ছোট শিশু সন্তানটি মাইকেল মাদ্রাসা ছাড়ার কয়েকদিন পরেই মারা যায়। এর পরে রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের আর কোনদিন দেখা হয়নি। রেবেকা ও তাঁদের সন্তানদের কি পরিণতি হল সে খবরও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নেই।

তবে The Captive Ladie ইংরাজ মহলে অনুকূল সমলোচনা পেতে ব্যার্থ হয়েছিল। তাঁর ইংরাজী কবিতাগুলিও ইউরোপীয় সাহিত্য মহলে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেনি। সাহিত্য সৃষ্টির উচ্চাশায় বিফল হয়ে, স্ত্রী সন্তানকে পরিত্যাগ করে এবং আর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে মাইকেলের ঠিক কি মানসিক অবস্থা ছিল জানা নেই। তবে এই প্রত্যাবর্তন মাইকেলের জীবনে এক সন্ধিক্ষ সূচনা করে।

“রেখো মা দাসেরে মনে”
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও মধুকবির আত্মপ্রকাশ

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর মাইকেলের জীবন ছিল কিছুটা নোঙরহীন নৌকার মত। প্রথমে এসে উঠেছিলেন রেভাবেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর বাড়ী। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমাতেও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তিনি সঞ্চিত অর্থ নিয়ে মাদ্রাসা থেকে ফেরেন নি এবং ধর্মান্তারিত হওয়ার দরুন পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে কিছু অর্থ লাভ করেননি। তবে পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হল। গৌরদাস বসাক মাইকেলের জীবন চর্যা ও জীবন দর্শন নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও তিনি চিরসখার মত মাইকেলের পাশে থেকেছেন।

কিশোরিচাঁদ মিত্র মাইকেলের পুরোনো বন্ধু এবং তৎকালীন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মাইকেলকে তাঁর অফিসে কেরানীর চাকরী দিলেন এবং তাঁর বাগান বাড়িতে থাকতে দিলেন। সেই বাগানবাড়ী ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির আড্ডাস্থল। তৎকালীন বহু চিন্তাবিদ ও সাহিত্যসেবী মানুষ সেই আড্ডায় যোগদান করতেন। মাইকেলের সৃষ্টিশীল সত্ত্বা এই আবহে পুনর্জন্ম লাভ করল। সেই সময় থেকেই মাইকেল মাতৃভাষায় লেখার চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

এই বিদ্বজ্জন সমাজের মাধ্যমে মাইকেলের কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং পাইক পাড়ার নাট্যমোদী দুই জমিদার ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের অভিনয় চলাকালীন ইংরাজ এবং অবাঙালী দর্শক আকৃষ্ট করার জন্য মধুসূদনকে নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন। তিনি জেদ, আত্মবিশ্বাস ও অহংবোধের সঙ্গে রত্নাবলী অনুবাদ করেন। কিন্তু মাইকেলের মন ভরেনি। “অলিক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রানে নিহি সয়” - এই আক্ষেপে নতুন কিছু সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করতে শুরু করলেন। লিখে ফেললেন শর্মিষ্ঠা, যেটি বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক। এছাড়াও

দুটি সামাজিক প্রহসন— "একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রোঁ"।

ইতিমধ্যে হেনরিয়েটা মাদ্রাস থেকে কলকাতায় এসে পড়েছেন। কবির সঙ্গে তাঁর সেখানেই প্রেমপূর্ণ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় দম্পতি হিসাবে একত্রে থাকা শুরু করলেন। তাঁদের প্রথাগত বিবাহ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য মেলে না। কিন্তু তাঁদেরও চারজন সন্তান জন্মেছিল। হেনরিয়েটা ছিলেন মাইকেলের শেষ পনের বছরের সঙ্গিনী। সংক্ষেপে বলা যায় মাইকেল ও হেনরিয়েটার সংসার নিরবিচ্ছিন্নভাবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে চলেনি। মাইকেলের অমিতব্যয়িতা এবং সাংসারিক বোধের অভাব তার জন্য অবশ্যই দায়ী ছিল। কিন্তু আর্থিক অনটন কখনই মাইকেলের সাহিত্য সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও পেশাগত ভাবে তিনি অসন্তোষে দিন কাটাতেন।

কলকাতায় সাহিত্য সৃষ্টিরকালে মধুসূদন ধীরে ধীরে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হওয়ার প্রয়াস শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজস্ব সাহিত্য শৈলী তৈরী করার দিকে অগ্রসর হয়েছেন— বিশেষ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেটি তাঁকে মহাকবির শিরোপা এনে দিয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা নাটকের পর তিনি লিখলেন পদ্মাবতী নাটক। শর্মিষ্ঠা নাটকে যে পরিমাণ বিদেশী প্রভাব ছিল পদ্মাবতী নাটকে তিনি সচেতনভাবে বিদেশী প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন। পদ্মাবতী নাটকটির অসাধারণ নাট্যসম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি সেটা গুছিয়ে করতে পারেন নি কিন্তু এই নাটক তাঁকে অন্য পথের দিশা দেখায়। তিনি পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন। তিনি শুধুমাত্র কবিতার ছন্দে নাটক লিখে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্মাবতী নাটক এক অভাবনীয়, অমূল্য সৃষ্টি।

মাইকেলের সাহিত্য সৃষ্টির পৃষ্টপোষক বিশেষ করে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মাইকেলকে হলফ করে বলেছিলেন যে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা অসম্ভব। মাইকেল সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করলেন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। এই নাটকটি এক অপূর্ব সৃষ্টি। মাইকেল হিন্দুকলেজে পড়া কালীন বেশ কিছু সনেট লিখেছিলেন এবং ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেন। এই অসাধারণ প্রতিভার কবি এবার মাতৃভাষায় নিজের ভূমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করলেন।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের ভিত্তি ছিল হিন্দু পুরাণ কাহিনী। পদ্মাবতী নাটকে তিনি গ্রীক মিথোলজির সঙ্গে হিন্দু পুরাণের মিশ্রন করেন। কিন্তু তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যতে তিনি বিদেশী উপাদান বর্জন করারই চেষ্টা করেছিলেন। এ এক নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নিজেও বলেছেন - "এ কাব্য হল বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য"। অবশ্য মাইকেল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকটির অনুবাদ করেছিলেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য এবং ব্রজঙ্গনা কাব্য মাইকেলর কবি প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন। দুটি কাব্যেরই বিষয়বস্তু হিন্দু পুরাণের নারী। তাঁর কাব্যে এই নারীদের কি অসাধারণ অভিব্যক্তি। দুটি কাব্যেই তিনি বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয় বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি ব্রজঙ্গনা কাব্যের প্রতিটি লাইনে প্রতিফলিত। যে মানুষটি এক সময় হিন্দু সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করে পাশ্চাত্ত সভ্যতার প্রাঙ্গনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এটা বোঝা দুষ্কর যে সেই মানুষটি বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব এবং আকৃতিকে কি অসাধারন আবেগ এবং ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন।

স্বল্প পরিসরে মাইকেলের সব কটি রচনার উপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তবে মেঘনাদ বধ কাব্য হল মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেটি তাকে মহাকবির শিরোপা এনে দিয়েছিল। মেঘনাদ

বধ কাব্য ছিল ঠিক মাইকেলের চিন্তা অনুযায়ী স্রোতের বিপক্ষে পাল তোলা এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই কাব্যে মেঘনাদ ছিলেন সার্থক নায়ক এবং ট্র্যাজিক হিরো। রাবণের মহত্বের আলো প্রতি পংক্তিতে আলোকিত করেছে। মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলার প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব, সাহস, তেজ, শক্তি এবং দর্প বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। রাম এবং লক্ষন ছিলেন উচ্ছাকাঙ্ক্ষী, কৌশলী, দুর্বল, ভাল এবং বেশীরভাগ মন্দে মেশানো 'মানুষ'। মাইকেল সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক কালে এই কাব্যটি প্রশংসা এবং নিন্দা দুইই অর্জন করেছিল। তবে এ কাব্য কালজয়ী। বাংলা তথা ভারতের সাহিত্যে এক উজ্জল জ্যোতিষ্ক।

প্রবাসে দৈবের বসে : মাইকেলের ইংল্যান্ড যাত্রা

কলকাতায় ফিরে মাইকেল যে নতুন সাহিত্য জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন তাতে তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন না। চাকরী ক্ষেত্রেও সন্মানজনক পদ লাভ করেন নি। তিনি নিজে জানতেন যে তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভার একজন মানুষ। স্বাবভিকভাবেই তিনি যশোকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ধনী পরিবারের সন্তান হয়ে বাল্যকাল থেকেই স্বাচ্ছল্যে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু জীবন তাকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়েছিল। উকিল পিতার সন্তান হয়ে তিনি জানতেন যে আইন ব্যবসায় প্রভূত অর্থ। তাই তিনি ১৮৬২ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি যা অর্থ লাভ করেছিলেন পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দিয়ে গেলেন।

বিলাত থেকে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠি ও একটি ছোট কবিতা পাঠান। কবিতাটির নাম বঙ্গভূমির প্রতি। এটি মাইকেলের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি যে অসাধারণ অনুরাগ এবং কিছুটা অপরাধ বোধ তারই উচ্ছাস ভরা কাব্যিক প্রকাশ।

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হতে, - নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।

কাব্যসাধনা ছেড়ে দিয়ে তিনি যে বিদেশে পাড়ি দিলেন সেই অপরাধ বোধ কবিতাটিকে আচ্ছন্ন করেছে।

মধুসূদনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, এটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বিদ্যাসাগর মশাই নিজে মধুকবিকে বিলাত যাত্রার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ইংল্যান্ড যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন কবিখ্যাতি অর্জন করার জন্য। তবুও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তিনি প্রভূত উৎসাহ সহকারে ইংল্যান্ডে পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক ভাগ্য মধুসূদনকে কোনদিনই সহায়তা করে নি। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি যাঁর সঙ্গে টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন তিনি তাঁর কথার খেলাপ করেছিলেন হেনরিয়েটা সন্তানদের নিয়ে প্রবল আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হলেন। তাঁর জ্ঞাতীভাইরাও হেনরিয়েটাকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ করেছিলেন।

অবশেষে হেনরিয়েটা কবির সম্মতি নিয়ে লন্ডন যাত্রা করলেন। হেনরিয়েটা তাঁর সন্তানদের নিয়ে পৌঁছনোর পর আর্থিক দুর্গতির অন্ত ছিল না। অবশেষে বিদ্যাসাগরকে জানানোর পর তিনি বিদ্যাসাগরের নিয়মিত সাহায্য লাভ করতে থাকেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হয়ত কিছু অর্থ লাভ করতেন। কিন্তু মাইকেল তো হিসাবের মধ্যে থাকার মনোভাব কোনদিনই অর্জন করেন

নি। তাই চারদিকে ধারকার্য করে অমিতব্যায়ী জীবন যাপন করে চললেন।

মাইকেল তো শুধু বেহিসাবী নয় হঠকারীও ছিলেন। তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সপরিবারে লন্ডন থেকে ভার্সাই গিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিকে দেনার বোঝা, গর্ভবতী স্ত্রী এবং অন্যদিকে ব্যারিস্টারি পাস করার চাপ - কবির জীবনের দুর্বিসহ মুহূর্তগুলি সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম করে তিনি কোনদিনই টাকা রোজগারের চেষ্টা করেন নি। এইসময় বিদ্যাসাগর যথাসাধ্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মাইকেল ক্রমাগত বিদ্যাসাগরকে চিঠি পাঠাতেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু কোনদিনই বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। উল্টে নিজে তো টাকা পাঠাতেনই, মাইকেলের সম্পত্তি বন্ধক না রেখে যাতে টাকার ব্যবস্থা করা যায় সর্বক্ষন সেই চেষ্টা করতেন।

মাইকেল ১৮৬৭ সালে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় ফেরৎ আসেন। তিনি প্র্যাকটিসও শুরু করে দেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আর্থিক পরিস্থিতির কোনভাবে উন্নতি হয়নি। তার কারণ তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং আয়ের তুলনায় ব্যায়ের আধিক্য।

১৮৭২ সালে পুরুলিয়ার পঞ্চকোটে রাজা মাইকেলকে এস্টেটের ম্যানেজার পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু মাইকেল সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি। রাজবাড়ীর নানা বিধ চক্রান্ত, অবৈধ কার্যকলাপ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং আবার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন।

ইতিমধ্যে মাইকেলের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। ক্রনিক গলার সমস্যা, রিউম্যাটিক হার্ট, যকৃতের রোগ তাঁকে জর্জরিত করে ফেলেছিল। প্রায়শই তাঁর রক্তবমি হত এবং শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা থাকত। শারীরিক কারণে কোর্টে প্র্যাকটিস করাও বন্ধ করে দিতে হল। নিজেদের আসবাব পত্র, দামী জিনিস এমনকি

জামাকাপড় ও বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভুলে থাকার জন্য নিজেকে মদে ডুবিয়ে রাখতেন।

এই সময় উত্তরপাড়ার জমিদার তাঁকে শরীর সারানোর জন্য নিমন্ত্রন করে নিয়ে গেলেন এবং গঙ্গার ধারে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু শরীর তাঁর আর সারল না। হেনরিয়েটাও সমধিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গৌরদাস মাইকেলকে আবার বেনিয়াপুকুরে তাঁর বাড়ীতে ফেরৎ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মাইকেল হেনরিয়েটা দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাইকেলকে তৎকালীন আলিপুর জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয়। যেখানে ইউরোপীয় ছাড়া আর কেউ ভর্তি হতে পারতেন না। হেনরিয়েটাকে তাঁর জামাই বাড়ীতে থেকে দেখাশুনা করতে থাকলেন। ১৮৭৩ সালে জুন মাসে প্রথমে হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়। তার তিনদিন পরেই মাইকেলের জীবনাবসান হয়।

মাইকেল মৃত্যুশয্যায় অনেক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও দেখতে এসেছিলেন। তাঁর মরদেহ নিয়ে ৩০শে জুন অগণিত ভক্ত এবং প্রিয়জন - প্রায় হাজার খানেকের বেশী - লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানের দিকে শেষ যাত্রায় সামিল হন। কবিকে সমাধিস্থ করার সময় চার্চগুলির মধ্যে প্রভূত বিতর্ক এবং বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড বিশপ তাঁকে সমাহিত করার ব্যাপারে প্রবল দ্বিধা প্রদর্শন করেছিল। অবশেষে লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানে হেনরিয়েটার কবরের পাশে মধুকবির মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

“লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে”

মধুকবির জীবনের কোন উপসংহার নেই। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা যুগে যুগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। সহজ দৃষ্টিতে ‘মানুষ’ মধুসূদনকে বিচার করা অসম্ভব। তাঁর আপাত বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি ভালবাসা, ক্রোধ, স্বজনশীলতা, ঘৃণা, মমতা জাগায়।

কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্ত্তি অপার বিস্ময় এবং সম্ভ্রম জাগায়। মাইকেল নিজের জীবন নিয়ে শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন - হয়ত কেউ বলতে পারেন ছিনিমিনি খেলেছেন। ধনী পরীবারের সন্তান হয়ে সারা জীবন আর্থিক অনটনকেই আহ্বান করেছেন। কিন্তু এই মানুষটিই নতুন পদশৈলী সৃষ্টি করে, নতুন ছন্দ সৃষ্টি করে বাংলা ভাষাকে বিশ্বমানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেন।

মাইকেলের সমসাময়িক অথবা কনিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ তাঁর লেখার প্রভূত বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরূপ সমালোচনাকে প্রত্যাহার করেছিলেন। আসলে মাইকেল মধুসূদন দত্তর প্রতিভা সৃজনীশক্তির ব্যাপ্তি এবং সাহিত্যে মৌলিক অবদান সে যুগে বসে উপলব্ধি করা ছিল কঠিন। তিনি ছিলেন যুগশ্রষ্টা। মাইকেল নিজেই কি নিজেকে বুঝেছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁর সৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন। কিন্তু এও বাহ্য। তাঁর নিজের মধ্যেও দ্বিধা, অনিশ্চয়তা এবং অপরাধবোধ কম ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যে মোহের কারণে তিনি মাতৃভাষাকে অবহেলা করেছিলেন তার জন্য তাঁর আপশোষের অন্ত ছিল না। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে বড় মাধুর্য ছিল যে তিনি মধুকবি হয়ে বাঙালী তথা দেশবাসীর অন্তরে ঠাঁই চেয়েছিলেন। মোজোর্ট যেমন নিজের Requiem লিখেছিলেন, তেমনি মাইকেলও মৃত্যুর আগে নিজের সমাধিলিপি লিখে গেছেন -

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননি জাহ্নবী!

এই সমাধিলিপি ছিল তাঁর আত্মপরিচয়কে মনে রাখার আর্তি যা এখনও বাঙালীর হৃদয়ে সযত্নে লালিত আছে।

আকর গ্রন্থ

1. Bose, Amalendu, Makevs of Indian Literature : Michael Madhusudan Dutt, Sahitya, New Delhi, 1981.
2. Sen, Sukumar, History of Bengali Literature, New Delhi, 1960.
3. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, মহাকবি শ্রীমধুসূদন, কলকাতা, কলকাতা বুক হাউস, ১৯৬৮
4. গুপ্ত, ক্ষেত্র, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, কলকাতা, গ্রন্থালয়, ১৯৬২
5. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো., ১৯৬০
6. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৯ (নব সংস্করণ)
7. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫

HELPLINE

1800 120 2130

VISIT US AT

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A statutory corporation of Govt. of West Bengal)

'Amber', DD-27/E, Salt Lake, Sector-1, Kolkata-700064